2 nd sem GCC

উপভাষা

উপভাষা প্রমিত ভাষার (Standard Language) পাশাপাশি প্রচলিত অঞ্চলবিশেষের জনগোষ্ঠী কর্তৃক ব্যবহৃত আঞ্চলিক ভাষা। পৃথিবীর সর্বত্রই প্রমিত ভাষার পাশাপাশি এক বা একাধিক আঞ্চলিক ভাষা বা উপভাষা (Dialect) ব্যবহৃত হয়ে থাকে। প্রমিত ভাষার সঙ্গে উপভাষার ব্যবধান ধ্বনি, রূপমূল, উচ্চারণ ও ব্যাকরণগত কাঠামোর মধ্যে নিহিত থাকে। সাধারণত প্রমিত ভাষায় ভাষাভঙ্গির সংখ্যা বৃদ্ধি, ভৌগোলিক ব্যবধান এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক শ্রেণিবিন্যাসগত পার্থক্যের কারণে উপভাষার সৃষ্টি হয়। প্রমিত ভাষা দেশের সর্বস্তরে ব্যবহৃত হয়; লিখিত পদ্ধতির ক্ষেত্রেও তা অনুসৃত হয়, কিন্তু উপভাষার ব্যবহার কেবল বিশেষ অঞ্চলের জনসাধারণের মধ্যেই সীমিত থাকে।

বাংলাদেশে বিভিন্ন অঞ্চলের ভৌগোলিক অবস্থান, যোগাযোগ ব্যবস্থার অভাব, অর্থনৈতিক বৈষম্য এবং সামাজিক ও ধর্মীয় কারণে বিভিন্ন উপভাষার সৃষ্টি হয়েছে। ব্রিটিশ আমলে কলকাতায় স্বতন্ত্র শ্রেণির প্রমিত ভাষা গড়ে উঠলেও ঢাকায় তা হয়নি; এমনকি ঢাকা বাংলাদেশের রাজধানী হওয়ার পরেও নয়।

বাংলাদেশের উপভাষাসমূহকে প্রধানত চার শ্রেণিতে ভাগ করা যায়, যথা: ১. উত্তরবঙ্গীয় দিনাজপুর, রাজশাহী, বগুড়া ও পাবনায় প্রচলিত উপভাষা; ২. রাজবংশী রংপুরের উপভাষা; ৩. পূর্ববঙ্গীয় (ক) ঢাকা, ময়মনসিংহ, ত্রিপুরা, বরিশাল ও সিলেটের উপভাষা, (খ) ফরিদপুর, যশোর ও খুলনার উপভাষা এবং ৪. দক্ষিণাঞ্চলীয় চট্টগ্রাম, নোয়াখালী ও চাকমা উপভাষা। পশ্চিমবঙ্গের উপভাষাগুলি প্রধানত দু শ্রেণিতে বিভক্ত: ১. রাঢ়ী ও ঝাড়খন্ডী (দক্ষিণ-পশ্চিম বর্ধমান ও প্রেসিডেন্সি বিভাগের অধিকাংশ) এবং ২. বরেন্দ্রী ও কামরূপী (গোয়ালপাড়া থেকে পূর্ণিয়া পর্যন্ত)।

বাংলাদেশে উপভাষার বহুল ব্যবহারের জন্য উপভাষাভাষী ও প্রমিত ভাষাভাষীদের মধ্যে বৈষম্য লক্ষ্য করা যায়। বাংলা ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রে তিনটি ভাষারীতি সমানভাবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। সাধারণভাবে শিক্ষিত শ্রেণির মধ্যে লেখ্য ও কথ্যরূপে প্রমিত বাংলা, লিখিতরূপে ও পাঠ্যপুস্তকে সাধু/চলিত রীতি এবং বিভিন্ন অঞ্চলের ভাষাভাষীদের মধ্যে মৌখিক ভাষারূপে উপভাষা ব্যবহৃত হয়। প্রমিত বাংলা ব্যবহারকারীরা প্রমিত সাধু/চলিত রীতি ব্যবহার করে থাকে। উপভাষা অঞ্চল থেকে আগত ভাষাভাষীরা বাংলা ভাষার দুটি রূপ ব্যবহার করে। তারা বাড়িতে আঞ্চলিক রূপ এবং সর্বসাধারণের সঙ্গে ও শিক্ষার প্রয়োজনে সাধু/চলিত রীতিতে প্রমিত রূপ ব্যবহার করে। বর্তমানে অবশ্য সাধুরীতির ব্যবহার অনেকাংশে হ্রাস পেয়েছে।

প্রমিত বাংলা ভাষা উপভাষায় কেমন রূপ লাভ করে তা একটি উদাহরণের মাধ্যমে বোঝানো যেতে পারে। যেমন ‘ছেলে’ শব্দটিকে বিভিন্ন উপভাষায় যেভাবে উচ্চারণ করা হয় তা হলো এরূপ: পো (মেদিনীপুর), ব্যাটা (মালদহ), বেটা (মানভূম), ছা (সিংহভূম), ছাওয়াল (খুলনা, যশোর), ব্যাটা ছৈল (বগুড়া), পোলা (ঢাকা, ফরিদপুর), পুত

(ময়মনসিংহ), পুয়া (সিলেট), পুতো (মণিপুর), পোয়া (চট্টগ্রাম, চাকমা) এবং হুত (নোয়াখালী)।

অনেক সময় একই ভাষারূপ ব্যবহার করা সত্ত্বেও ব্যক্তি-বিশেষের উচ্চারণে স্বাতন্ত্র্যের সৃষ্টি হয়। এ ধরনের স্বাতন্ত্র্য সাধারণত শিক্ষা, সংস্কৃতি, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় মর্যাদা কিংবা পেশাগত কারণে হয়ে থাকে। ব্যক্তি-বিশেষে ভাষার এ রীতি 'ব্যক্তি-বিশেষের বাক্রীতি' (Idiolect) হিসেবে পরিচিত। অনেকে উপভাষার সঙ্গে অশিষ্ট ভাষার (Slang) সম্পর্কের উল্লেখ করলেও উভয় ভাষারীতির মধ্যে পার্থক্য আছে। প্রথমত, উপভাষা বিস্তৃত অর্থে ব্যবহৃত হলেও অশিষ্ট ভাষা শুধু রূপমূলের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। দ্বিতীয়ত, অশিষ্ট ভাষার জীবনকাল স্বল্পমেয়াদি। তৃতীয়ত, অশিষ্ট ভাষা স্বেচ্ছাকৃতভাবে ব্যবহৃত হয়, যেমন 'গ্যাঞ্জাম'। এ ছাড়া সামাজিক, অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় কারণে নারী-পুরুষের ভাষা, হিন্দু-মুসলমানের ভাষা, শিক্ষিত-অশিক্ষিতের ভাষা এবং শহর ও গ্রামের ভাষার মধ্যেও পার্থক্য সূচিত হয়। উপভাষার বিশ্লেষণ এবং এর অভিধান ও মানচিত্র প্রণয়নের প্রাথমিক প্রস্তুতি হিসেবে উপভাষা জরিপ প্রয়োজনীয়। উপভাষার মানচিত্রে কোনো বিশেষ অঞ্চলের শব্দের উচ্চারণ এবং পার্থক্যসহ ধ্বনির রূপান্তর নির্দেশিত হয়ে থাকে। আঞ্চলিক অভিধানে একটি দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের শব্দের বানান, উচ্চারণ, ব্যুৎপত্তি ও অর্থের ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। বাংলাদেশের আঞ্চলিক ভাষার অভিধান ১৯৬৫ সালে মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ সম্পাদনায় বাংলা একাডেমী থেকে প্রকাশিত হয়।